চাপের নিচে তরুণ মন: শিক্ষার্থীদের মানসিক যন্ত্রণা ও আত্মহত্যার আশঙ্কা



সংগৃহীত ছবি

বর্তমান সমাজে শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে। পরীক্ষায় ভালো ফল, উচ্চশিক্ষার প্রতিযোগিতা, পরিবারের প্রত্যাশা এবং সামাজিক তুলনার চাপে অনেক শিক্ষার্থী মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছে। এককভাবে এত চাপ সামলাতে না পেরে তারা হতাশায় ডুবে যায়। এই হতাশা অনেক সময় এতটাই তীব্র হয় যে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে অনেকে। বিষয়টি এখন আর আলাদা আলাদা ঘটনার চিত্র নয়—বরং একটি বড় সামাজিক সংকটে রূপ নিয়েছে।

শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপে পড়ার কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো—অতিরিক্ত পাঠ্যক্রমের চাপ, শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিযোগিতামূলক ধারা এবং পারিবারিক বা সামাজিক প্রত্যাশা। শিশু বয়স থেকেই তাদের বলা হয় "ফার্স্ট হতে হবে", "নম্বর পেতেই হবে", "ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে"—এসব বাক্য যেন শিক্ষার্থীদের মানসিক ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যর্থতার ভয়, সামাজিক লজ্জা ও নিজের অপ্রাপ্তি নিয়ে হতাশায় ভুগছে অনেক তরুণ-তরুণী।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটে যাওয়া আত্মহত্যার ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, একটি বড় অংশ শিক্ষার্থী। সম্প্রতি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়াদের মধ্যেও মানসিক অসুস্থতা বেড়ে চলেছে। অনেকে কোনো এক মুহূর্তের চাপে চিরতরে থেমে যাচ্ছে—যার পেছনে রয়েছে অব্যক্ত মানসিক যন্ত্রণা।

পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় অভিভাবকরা সন্তানের মানসিক অবস্থা বুঝতে পারেন না, বা তা বুঝলেও গুরুত্ব দেন না। মানসিক সমস্যা নিয়ে কথা বললে অনেকেই এটিকে দুর্বলতা বা "পাগলামি" ভেবে উড়িয়ে দেন। ফলে শিক্ষার্থীরা নিজের কষ্টের কথা বলার সুযোগ পায় না। এতে করে তারা আরও একা হয়ে পড়ে। একাকীত্ব, অবহেলা ও চাপ মিলে একসময় এই তরুণদের ঠেলে দেয় বিপরীতমুখী সিদ্ধান্তের দিকে।

মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞদের মতে, স্কুল-কলেজ পর্যায়ে মনোবিজ্ঞানী বা কাউন্সেলিং সেবা থাকা জরুরি। শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থা বুঝতে শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানে একটি 'সহমর্মী পরিবেশ' তৈরি হলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের উদ্বেগ, ভয় বা হতাশা নিয়ে সহজে কথা বলতে পারবে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা ঠেকাতে হলে আমাদের সমাজে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে দিতে হবে—সাফল্যই সব নয়, ব্যর্থতা জীবনের অংশ, আর মানসিক কষ্ট হলে কথা বলা জরুরি। পরিবারে ভালোবাসা, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ এবং যত্নশীল মনোযোগ একজন শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে শক্ত রাখতে পারে। প্রয়োজনে পেশাদার সাহায্য নেওয়াটাও স্বাভাবিক—এমন ধারণা সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

শিক্ষার্থীরা দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের মন ও মননের স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলে আগামীর নেতৃত্ব দুর্বল হবে। তাই এখনই প্রয়োজন নীতিনির্ধারক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবার ও সমাজের সমন্বিত উদ্যোগ—যাতে চাপ নয়, সমর্থন ও সহমর্মিতা নিয়ে গড়ে ওঠে শিক্ষার্থীদের সুন্দর ভবিষ্যৎ।